# চণ্ডীমণ্ডপ

ড.স্বপনকুমার ঠাকুর

রাঢ় অঞ্চলের গাঁ গঞ্জ। গাঁয়ে ঢুকলেই চোখে পড়বে সারি সারি কাঁচা-পাকা বাড়ি।সাঁই সাঁই ধানের মরাই।পাল্লা দিয়ে খড়ের পালা।এঁদোডোবা।তালগাছ ঘেরা দিঘি।ভাঙাচোরা মন্দির।আর অবশ্যই গাঁ-ষোল আনার চণ্ডীমণ্ডপ।কোথাও সুদৃশ্য দালানকোঠা।কোথাও অভ্রভেদী মন্দির।কোথাও বা হেলে পড়া সাবেকি চৌরী মাটিরবাড়ি।লোকে বলে মোড়কতলা।শিবতলা অথবা বারোয়ারিতলা।

চণ্ডীমণ্ডপ!গ্রামজীবনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সম্পদ।সবচেয়ে পরিচিত স্থান। ঠাকুর দেবতার পুজো আচ্চা থেকে শুরু করে ঝগড়া বিবাদের মিমাংসা বিয়েথা'র বরযাত্রী খাওয়ানো সবেতেই চণ্ডীমণ্ডপের আটচালা।ঠাকুরের গায়ে মাটি দেওয়া থেকে শুরু করে পুজো পর্যন্ত ছেলেপুলের ঠিকানা এই চণ্ডীমণ্ডপ।জমিদারি আমলে এখানেই বসতো সরকারি পাঠশালা।আবার যার কেউ থাকতো না , কেউ যাকে দেখতো না সে মোড়কতলায় নিত শেষ আশ্রয়। অনাথ থুথথুরি ঠাকরুনবুড়ি। কুলো পেতে বসে থাকতো।যার ইচ্ছে হতো সিধে দিতো। এক খাবা চাল।একটা আলু বা বেগুন।ঘুঁটের জ্বালে মাটির মালসা পুড়িয়ে একপাকে রান্না। তাতেই তার পেট চলে যেত দিব্বি। বুঝতে পেরেছিলাম দেউলিয়া কাকে বলে।

চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামজীবনে নিজেই ছিল সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিষ্ঠান।গাঁয়ের ভালো মন্দ সবই তার সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে।শুধুই অপরাধীর বিচার করা নয়,নবানের দিন ঠিক করা,দিদিঠাকুরুনের পুজো আনা,বিপদতারিণীব্রত করা সবেতেই চণ্ডীমণ্ডপ। ধানপাকার সময় মাঠ আগল কারা নেবে, রাতপাহাড়ায় কার পালা কবে পড়বে,তাও ঠিক হয় চণ্ডীমণ্ডপে বসে।তারপর একসময় দৃশ্যত মাটির চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙে পাকামন্দির হয়েছে। ভোল বদল হয়েছে তার আকৃতি ও প্রকৃতির। তেমনি গ্রামজীবন থেকে আলগা হয়ে ভেঙে পড়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসা এই ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো। এখন চণ্ডীমণ্ডপ বলতে নিছক একটি ক্লাব বা বারোয়ারিতলা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গণদেবতা উপন্যাসে চণ্ডীমণ্ডপ সম্পর্কে লিখেছিলেন--"যে চণ্ডীমণ্ডপ একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল।পূজাপার্বণ,আনন্দ,উৎসব ,অন্নপ্রাশন,বিবাহ,শ্রাদ্ধ--সব অনুষ্ঠিত হইতো এইখানে।অন্যায়-অবিচার-উৎপীড়ন, বিশৃণখলা-ব্যাভিচার-পাপ গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েত।এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত,শাসন করিয়া সেসমস্ত দূর করা হইতো।গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর হইতে সে ডাক শোনা যায়।সে ডাক উপেক্ষা করিবার কাহারো সামর্থ্য ছিল না।..."সেই ভেঙে পড়া চণ্ডীমণ্ডপের কাহিনী শোনাতে চাই । তবে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেকার চণ্ডীমণ্ডপের গল্প। একটি বিশেষ সময়ের কাহিনী।
তখনকার গ্রাম আর এখনকার গ্রামের বিস্তর ফারাক।ইলেকট্রিক সব গ্রামে আসেনি। টিভি কম্পিউটার অনেক পরের কথা। সারা গাঁয়ে একখানা রেডিয়ো।মহালয়ার দিনে রেডিও শুনতে সকলেই ভিড় করতো।বর্ষাকালে এক হেঁটো কাদা।পাকাবাড়ি হাতে গোনা।খরানি অর্থাৎ গ্রীষ্মের বোরোধানের চাষ তখন দূর অস্ত!লেখাপড়ার হার শুনলে একালের ছেলেপুলে হেসে লুটোপুটি।দামড়া দামড়া ছেলে।ক্লাস নাইনে তিনবার ফেল করে হাত পড়েছে নাঙলের বোঁটায়।

চাষিবাসি লোকের বাস।সারাদিন হাড়ভাঙা খাটাখাটনি।সাঁজবেলায় চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাস পাশা খেলার আসর।আর পাল্লা দিয়ে বিড়ি গাঁজা টানা।যারা বয়স্ক চাষি আর মাঠে ঘাটে যেতে পারতো না সকাল থেকে তারা চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় নিত।শনের দড়ি পাকাতো।আর ঘন ঘন তামাক টেনে গল্পগুজোব করে সময় কাটাতো।লোকে বলতো ধেঁধলাঘর!মানে আলসে লোকের বাস।

ঘর বলতে দখিন দুয়োরি বাংলা ঘর ।গাঁয়ের ভাষায় চৌরিঘর বা সাবেকিঘর। প্রতি বছর উপরে উপরে ছাওয়াতে হয়।ঝেড়েঝুড়ে পাঁচ বছর অন্তর। খড়ো চালের বাঁকানো কার্নিশ। অনেকখানি নামু। ।যেন ঝুঁকে পড়ে মাটি ছুঁতে চায়। দুপাশে ছোট ছোট দুখান ঘর।একটায় থাকে কবেকার পুরানো জমিদারি শিব।অন্যটাকে বলে যোগাড়ে ঘর।পুজোর সময় যোগাড়যন্তর এই ঘরেই হয়।মাঝখানে বেশ প্রশস্ত আয়তকার ঠাকুরঘর।এখানেই মা দুগগার আটন। মাথার উপরে অনেকটা উঁচুতে ছোট্ট চাঁদোয়া টাঙানো।বামুনঠাকুর প্রতিদিন অং নমো ঢং নমো পুজো সেরে তিনমিনিটেই ফুরুত ধাঁ।

চণ্ডীমণ্ডপে জানলা নেই।তারবদলে কুলুঙ্গি আছে কয়েকটা। একটা কুলুঙ্গিতে থাকে বাণেশ্বর।খরোঠি করা ঘর।দেওয়ালের গায়ে অর্ধ রিলিফে খোদাইকরা বেশ কিছু মোটা মাপের জীবজন্তুর মডেল।

যেমন সিংহ,টিয়াপাখি বিড়াল ইত্যাদি। মেঝেও কাঁচা।এখানে ওখানে ভোমস গর্ত।ইঁদুরের উৎপাত।আর সেই সঙ্গে তেনাদের মানে জাত সাপেরও দেখা মেলে মাঝে মাঝে।তবে সাপ কেউ মারে না।

লাগোয়া উঁচু দাওয়া।পৈঠে বেয়ে নেমে এলে ফাঁকা বর্গাকার সুবিস্তৃত উঠোন। পাশ দিয়ে চলে গেছে গ্রামের মূলরাস্তা।উঠোনে পুজোর সময় তালগাছের পাতা কেটে জাঁক দেওয়া হয়।সাময়িক আটচালা করার জন্য।কিম্বা বোশেখ মাসে অষ্টপ্রহর নামসঙ্কীর্তন করার জন্য হরিমন্দির।বাকিসময় যার যেমন মনে হয় কেউ ধানের পালা দেয়। কেউ আবার ধানসেদ্ধ করে শুকুতে দেয় মোড়কতলার এই প্রশস্ত অঙ্গনে।

চণ্ডীমণ্ডপের গায়ে বড় বড় ফাট। প্রতি বছর বর্ষার পর কাদা ভরাট করা হয়।এলামাটিতে নিকিয়ে চুকিয়ে ধারিগুলো আলকাতরায় রঞ্জিত। আলকাতরার গন্ধে পুজো আসছে পুজো আসছে ভাব।আগেকার দিনের শাল কাঁঠাল জাম কাঠের কাঠামো।শুঁড় ভাঁউরো ঘর আট খাটালের।মানে অর্ধবৃত্তাকার কাঠের কাজ।সরদলে বাহারি কড়ির যোগ।তাতে সাবেকি অলঙ্করণ।হাতির শুঁড় দিয়ে চাল আটকানো।ঠেকনোগুলো আজও জুতসই।বেশ নানারকমের কাঠের মডেল সরদলে আর পরদলে ভর্তি।যেমন ছোটলাইনের ছুটন্ত ট্রেনগাড়ি।হনুমান তাকডুমাডুম ঢোল বাজাচ্ছে।ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।কোথাও বা দুদোলো গাইগোরুর দুধের মোরে হোঁক্কা মেরে বাছুরের দুধ খাওয়ার দৃশ্য।খুঁটিগুলি অনেক ভেঙে গেছে।তবে বেশকিছু কাজ করা খুঁটি নজর কাড়ে। আলকাতরা মাখিয়ে জাত মেরে দিয়েছে।পরদলে উলটো করে খোদাই করা ১৩২৬ সন।মিস্ত্রি পেভাকর দাস। সাং পিলসোঙা।

চালের ছাঁটামোতে আজও রয়েছে রঙকরা ষড়কাটির কাজ।তা প্রায় একশো বছর হতে চললো।গাঁয়ে সবাই মাঝে মাঝে আলোচনায় বসে।এবার ভেঙে দিয়ে দুকুঠুরি দালান করা হোক।কিন্তু অনেকেই ভাঙতে রাজি না হয়ায় এই অবস্থায় আছে চণ্ডীমণ্ডপটি। গ্রাম্য আলোচনায় মাঝে মাঝে উঠে আসে চণ্ডীমণ্ডপ তৈরির ইতিহাস।

সাধন মোড়ল ।যেমন নামকরা মুনিষ তেমনি ডাকাবুকো সাহসী।গাঁয়ে তখন কিছুই ছিলনা। টিম টিম করে রায়েদের বাড়িতে একখান দুগগা ঠাকুর আসতো।ওতেই যাকিছু আনন্দ-আল্লাদ।বনকাপাশির

মুখুজ্জ্যেরা ছিল ডাকসাইটে জমিদার।তাদেরি মহাল এই গ্রাম।কেষ্ট মুখুজ্জ্যে ভারী সৌখিন ব্যক্তি।জমিদারি চালাতো ঝুনো নায়েবমশাই আর তিনি থাকতেন কলকাতায়।বড়বাজারে ছিল ভুঁসিমালের ব্যবসা। ফুলে ফেঁপে  বাবু ঢোল। বড়োলোকের খেয়াল।চক মিলান বাড়ি করবেন বাপঠাকুরদার ভিটেয়।তখন বাস ট্রেনের যুগ নয়।কলকাতা থেকে জলপথে নৌকা বোঝাই করে দামি দামি কাঠ নিয়ে এলেন। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে আমাদের ছোটনদি।কাঠ নিয়ে যেতে হবে  এই গ্রামের উপর দিয়েই।সাধন মোড়লসহ আর কয়েকজন যুক্তিযাক্তা করে সিদ্ধান্ত নিলে এই সুযোগ --কিছু কাঠ তাদের নির্মিয়মান চণ্ডীমণ্ডপের জন্য নিতেই হবে।বলাও যা কাজও তাই।কিন্তু দেওয়ালেরও কান থাকে।একদিন জমিদারের কাছাড়িবাড়িতে সাধনমোড়লদের ডাক পড়লো ।

---তোদের সাহস দেখে অবাক হচ্ছি! ভেবেছিসটা কি!মগের মুলুক নাকি!

--এজ্ঞে বাবু!আপনি আমাদের মা-বাপ!মায়ের কাজ!

----মায়ের কাজ বলে চুরি করবি!

--না বলে নেওয়া সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে বাবু!

--অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হবে! এই কে আছিস---

ঠিক এই সময় পর্দা ভেদ করে অভয়া মায়ের মতোই আবির্ভূত হয়েছিলেন জমিদার গিন্নি।তিনি এসে রাশ ধরলেন।বাবুর রা গেল উড়ে।জমিদারগিন্নির সহৃদয়তায় সে যাত্রায় শুধু বেঁচেই গেল না;-তিনি চণ্ডী্মণ্ডপের জন্য নগদ পাঁচশোটাকা দান করে উৎসাহ দিয়েছিলেন।আজও দুর্গাপুজোর নবমীর পাঁঠাবলি হয়  সেই দয়াবতী জমিদারগিন্নি ব্রজসুন্দুরির নামেই।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশেই এঁদো পুকুর।এখানেই জমিদারি শিবলিঙ্গটি বারোমাস থাকেন জলের তলায়।কবেকার শিব কে জানে।বহুদিন পূর্বে জোলের মাঠে চাষ করতে গিয়ে লিঙ্গ বিহীন এই গৌরীপট্টটিকে পাওয়া গিয়েছিল।তিনফুট লম্বা।আর ওজন কম করে দেড়মোন।গাঁয়ের লোকে বলে পাইনট।এই শিবকে কেন্দ্র করে  শিবের গাজন দেখার জিনিষ বটে!চোতমাস পড়লেই গ্রাম তখন অন্য।

প্রতি রোববার দুপুর থেকে সঙ বেরুতো।বাগদি পাড়ার অলক মাঝি ছিল সবচেয়ে উদ্যোগী।নামই হয়েছিল আলকাপ মাঝি।কোনদিন খ্যাপার চরিত্র। কোনদিন আবার দলবল নিয়ে স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া চুলোচুলি দৃশ্য।চোতমাসের মাঝামাঝি একদিন পাড়ায় পাড়ায় ঢেঁড়ি মানে ঢোল শহরৎ পড়লো। সাঁজবেলায় নেনোমুচি বাঁহাত মুখের কাছে গোল করে ধরে ডান হাতে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে--

---- শুনুন শুনুন শুনুন। কাল সঞ্জেবেলায় মোড়কতলায় বারোয়ারি মিটিন ডেকেছে।শিবের গাজন লিয়ে আলোচনা হবে।

ডুমডুম...ডুমডুম!শুনুন শুনুন...

**দুই**

মোড়কতলায় লোকে লোকারণ্য।দাওয়ায় বসে গাঁয়ের মোড়লরা। কুড়ো ঘোষ,বলা মোড়ল,কালীপদ ভচ্চার জেনা লাহারা।নিচে উঠোনে গ্রামবাসী আট থেকে আশি।তবে বউ ঝিদের আসার নিয়ম নেই। দুটো হ্যারিকেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দপ দপ করে জ্বলছে।সঞ্জয় মোড়লের হালকা বয়স।সেই মুখপাত্র।মোড়লদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে জোরে জোরে ঘোষণা করলে...

--গাজনে আর দুগগাপুজোয় চাঁদা এবার একটাকা করে বাড়ানো হলো।কারুর কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।

একটা গুঞ্জরণ উঠলো।অনেকেই বললে --এই মাজ্জিগণ্ডার বাজারে এক টাকাটা বড্ডা বেশি হয়ে গেলো।দুচার জনের কথা শোনার পর কুড়ো ঘোষ  গলা ঝেড়ে বললে-

-----যাদের দশ বিঘে জমি আছে তাদের একটাকা। আর যাদের দশ বিঘের কম তাদের বারোয়ানা চাঁদা বাড়লো।কি ? আর কিছু বলবে?সকলেই মোটামুটি মেনে নিলে মোড়লের কথা।

সঞ্জয় মোড়ল খাতা খুলে গম্ভীর হয়ে বলল--এবার একটা কথা শুনুন--গত সনে  ছয় বাড়ি চাঁদা দেয় নি। সবাই ঘটনাটা জানেন।এবার যদি জরিমানাসহ চাঁদা ঠিক সময়ে না দেয় তাহলে ঐ ছয়জনের বাড়িতে বাণেশ্বর যাবে না। তাতেও যদি না চেতে তাহলে নাপিত বামুন মুনিস রাখাল বন্ধ। এই হলো বারোয়ারির মত।এবার আপনারা যা বলবেন--!

উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে অনেকেই ছয়ঘরের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালো।একজন জিজ্ঞাসা করলো --জরিমানা কত?

--আট টাকা!যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারো।

অধীর মোড়ল বলে--তিনটাকা চাঁদা আর আটটাকা জরিমানা? এ যে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোয় বাপু!

অন্য একজন বললো --গরীব মানুষ!একটা মিমাংসা করে লাও।তখন না হয় ওরা একদিনে লবান করতে পারে নাই বলে মাথা ঠিক ছিল না। রাগে চাঁদা দেয়নি।শোধবোধ করে লাও। পুরোনো কাসুন্দি না ঘাঁটাই ভালো।কিগো মামা ?

অনেকেই হ্যাঁ হ্যাঁ করে সায় দিলে। আসল কথা হলো নিকট-আত্মীয় মারা যাওয়ার সূত্রে একইদিনে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান করতে পারেনি।এদিকে গাঁয়ের নির্ধারিত নবানের দিন আর পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সেই রাগে অভিমানে ছেমুরাগী(হঠাৎ যে রেগে যায়) পালেদের ন-কত্তা সত্যেন ছয়ঘরের চাঁদা দিয়েছিল বন্ধ করে।যাইহোক ছয় বাড়ির কর্তারা শেষপর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে জরিমানা দিতে স্বীকৃত হলো।একজন মধ্যস্থতা করে দিল।গাঁয়ের ভাষায় একে বলে গাউতি হওয়া।এবারের মিটিঙ'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গাজুনে ভক্তদের হব্বিষ্যির খরচ দেবে পুজো কমিটি।

চৈত্রমাসের চড়া রোদে মাঠ-ঘাট শুকুতে শুরু করেছে।পুকুর গড়ে খটখটে।আগুন লাগলে কি হবে এই ভেবেই সবাই সন্ত্রস্ত।এরি মধ্যে গাজনের কামান শুরু। এবার সতেরো জন সন্ন্যাসী কামিয়েছে।বীরভূম থেকে এসে গেছে জোড়া ঢাক।সকাল সন্ধ্যে সন্ন্যাসীরা গাজনতলায় বাজনার তালে তালে মাথা খাটে।তখন গ্রীষ্মের চাষ ওঠেনি।অঢেল সময় চাষীর হাতে।

গাজন এলেই খামারবাড়িতে শুরু হবে দেশি মাল মানে মদ তোলা।চাল চিটেগুড় আর বাকর দিয়ে পচাতে দেবে গোপন জায়গায়। তারপর সারারাত জেগে মালতোলা।এই মাল মানে মদ তোলার দক্ষ লোক হলো বাউরিপাড়ার মুনিসরা। এদিকে পাঁচুন্দির হাট থেকে কেনা হয়ে গেছে গাড়লভেড়া বা দশাসই খাসি।পাঁচ গাঁ থেকে কুটুমজনেরা আসবে।মাংসর ঝোল আর এই মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা সাবেকি রীতি।

পাড়ায় পাড়ায় ফাগুন মাস থেকেই বোলানের আখড়া শুরু হয়েছে রাতে।কোথাও দাঁড়বোলান,রণপা বোলান।কোথাও আবার সাঁওতালি বোলানের ছক্কা। মোড়কতলায় চলছে পরোবোলানের(কালকেপাতা) রিয়ার্সেল।মরার মাথা নিয়ে ভক্তরা এই বোলান গান গাইবে।মরার মাথার যোগান দেবে ভোক্ষা বাউরি।জমিদার এর জন্য তাদের পূর্বপুরুষকে এক বিঘা জমি দিয়েছিল। বোলানের দিনে কুমোরবাড়িতে গিয়ে মুখ এঁকে আসতে হবে।কালো কালীর ভয়াল মুখ।লাল লাল টানা টানা চোখ।তাতে হলুদের ফোঁটা।কোমর অবদি পরচুলা।কোমরে ঘণ্টা ঘুমুরের তোড়া।নাকে ইয়া টানা নথ।আসরে মরার মাথা মাঝে রেখে করুনসুরে পালাগান গাইবে।সঙ্গে ঢাক কাঁসির সঙ্গত।

---এসো মা গো সরস্বতী বসো গো মা পাশে

কি বোলে বোলান গাইবো বুড়ো শিবের কাছে।।

রাই সরু সরষে সরু,সরু গঙ্গার বালি।

মেটিরির রাম-সীতা বন্দন,জুড়ানপুরের কালী।।

উলোর ভুঁইয়ে ধুলো রে ভাই,মটরের ভুঁইয়ে খই

কালকে পাতা সেজে এলাম মড়ার মাথা কই? ইত্যাদি।

গানের শেষে শুরু হবে শকুননাচ।সঙ্গে ঢাক কাঁসির যুগলবন্দী।এর খরচ দেবে মোড়কতলার পুজো কমিটি।

২৭শে চৈত্র সকালবেলা।শঙ্কর হাড়ি বা হাড়িগিন্নি ঝাঁটা বালতি নিয়ে এসে মোড়কতলায় হাজির।ঝাঁট দিয়ে পরিস্কার করার পাশাপাশি গোবর জল ছিটানো তাদের দস্তুর।তবে ঠাকুরঘর নিকোবার হক নেই। সে কাজ করে বাগদিপাড়ার হারুর মা।এর জন্য পায় মাযোগাদ্যের বলির পশুমাথা।হাড়িরা পুজোর একটা নৈবেদ্য পায়। নাপিতদের কাজ পুজোর ফুলপাতা যোগান দেওয়া।ইতিমধ্যে ফুলবেলপাতা আর গুলঞ্চফুলের মালা চলে এসেছে ।এরজন্য তারাও একটি করে নৈবেদ্য পায়।আর পাঁচটাকা নগদ।ভচ্চাররা শিবের সেবাইত।১২ বিঘা জমি তাদের দেওয়া আছে।বিনিময়ে শিবের

বারোমাস সেবা তাদের চালাতে হয়।বামুনবাড়িতেই শিব থাকে বারোমাস।গাজনের চারদিন শুধু চণ্ডীমণ্ডপে।

সন্ধ্যে থেকেই মোড়কতলা ভিড়ে তিলধারনের জায়গা নেই।আজ শিবগাজনের বোলানের রাত।সন্ধে থেকেই হ্যাজাকের আলো জ্বলছে।বোলানের আসর দুটো।একেবারে পাশাপাশি।বোলান শুনতে এসেছে পাড়ার লোকেরা।বিশেষকরে মহিলারা। গিন্নিবান্নিরা।সন্ন্যাসীরা এই মাত্র বাণেশ্বর স্নান করিয়ে নিয়ে এলো ঠাকুরপুকুর থেকে।একদল মাতাল হাতে পাকা বাঁশের লাঠি  রামদা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরলো মোড়কতলায়।এটাই আনন্দ প্রকাশের মান্ধাতা কালের প্রথা।

ইতিমধ্যে একদল বোলান চলে এলো।মাদল কাঁসি খঞ্জনি ঝাঁই ঢোলের বাজনার সঙ্গে শিল্পীদের নাচ আর হৈ হৈ আওয়াজে মুখোরিত হয়ে উঠলো মোড়কতলা। গেঁয়ো মানুষের আনন্দ প্রকাশের কত রকমের যে রূপ এই সময় দেখা যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।অবশ্যি তারা মদে চুর থাকে। এই রাতে বাপ বেটাতে এক সঙ্গে মদ খায়।লোকে কিছু মনে করে না।বয়স হয়েছে  তাতে কি।ছেলে বউমা থাকলেতো বয়েই গেলো।আজকের রাতে সব ছাড়া।কেউ মাথা ন্যাড়া করেছে একদিক।কিম্ভূতকিমাকার লাগছে।কেউ কেউ বউ জামাই সেজেছে।মাথায় পরেছে বিয়ের টোপর।ঢাকের সঙ্গে উদ্দাম নাচ।কেউ বাণেশ্বরের নকল করে মাথায় বিশাল ঢেঁকি নিয়ে নাচছে।সাধে কি আর লোকে চোত খ্যাপা বলে।

রাত ক্রমশ বাড়ছে।বোলানের আসর জমে উঠেছে।আজকের রাতটিকে রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা বলে জাগরনের রাত।চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা বোলানগান শুনছেন।প্রতিটি বোলানদল শেষে দুমুখো তিনমুখো পাঁচালী পরিবেশন করে।একে বলে রঙটপ্পা পাঁচালী।একটু অশ্লীল।আধুনিকা মেয়ে বউদের  চুটিয়ে সমালোচনা  করে। শশুর বউমার  অবৈধ সম্পর্ক এসব পালার বিষয়।নাচে গানে অভিনয়ে বেশ জমিয়ে দেয়।লোকে শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলে না।ন-গাঁয়ের বলা মাঝির পাঁচালী যখন বেশ জমে উঠেছে তখনই ঘটলো অঘটন!

একটা হৈচৈ পড়ে গেল।পুবপাড়ার আর দক্ষিণপাড়ার লোকের মার লেগে গিয়েছে।কে কাকে ছাড়াবে।সবাই মদে চুর।বোলানের গানবাজনা বন্ধ।লোকজন সন্ত্রস্ত।বিরাট হাঙ্গামা।অবশ্য এই ধরনের ঝামেলা নতুন কিছু বিষয় নয়।কিন্তু সমস্যাটা এবার অন্য জায়গায়। গাঁয়ের মোড়লরা

দুপক্ষকে প্রায় ঠান্ডা করে ফেলেছিল।কিন্তু অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে অতর্কিতে রামদাটা চালিয়ে দিয়েছে পুবপাড়ার করুণার হাতে।আর রক্তারক্তিকাণ্ড। সামনেই ছিল পেঁচো মড়লের ছেলে রোহিত।আর যায় কোথায়!করুণার সাবেকি রাগ জমা ছিল তার প্রতি।ফরাম করে চুলির মুঠি ধরেই করুণা হিংস্র সিংহর মতো গর্জন করে উঠলো-তুই শালাই কুপিয়েছিস।হেঁসো চালান করে দিয়েছিস।

--খবরদার করুনা।মুখ সামলে কথা বলবি--

--বার কর তোর হেঁসো!

--আমি হেঁসো আনি নাই।

-চুপ শালা।

করুনার প্রচুর সমর্থক জুটে গেল।রোহিতের তুলনায় কম।

সেবারকার মতো অনুষ্ঠান একরকম নমো নমো কারে সারা হলে চণ্ডীমণ্ডপে বসলো এই নিয়ে বিচার।

করুনা প্রভাবশালী।মোড়লের লাত-জামাই।পেঁচোর বেটাকে বেঁধে আনা হয়েছে বিচ্ছিড়ি ভাবে।সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামের চৌকিদার রামধন বাউরি।বিচারে ৫০০ টাকা জরিমানা আর পাঁচ হাত নাকখতের ব্যবস্থা হলো। রোহিত এমনিতে ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছেলে হলে কি হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

----মামার বাড়ির আবদার।যা খুশি তাই।কোন অপরাধ করিনি-আবার নাকখত!

---চুপ বেয়াদপ।গাঁয়ের পাঁচজনের বিচার মানো না।ভাবো কি নিজেকে?

--ওকে নাকখত দিতেই হবে।করুণা গর্জন করে ওঠে।

---তোর কথাতেই নাকি? মিথ্যাবাদী কোথাকার--

এবার রোহিতের  বাবা কাকার তর্জন গর্জনে সে চুপ হয়ে গেল। শেষে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে  রফা হলো অন্যায় শ্বীকার করা।পরিস্থিতি ক্রমশ বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে দেখে রোহিত সবার সামনে দোষ কবুল করলো।তারপর একদিন  গ্রাম ছাড়লো রোহিত।

## তিন

বোশেখ মাস।সন্ধ্যে থেকেই হরিনাম সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা।চণ্ডীপমণ্ডপে আছে  খোল কর্তাল ঝম্প।সবই ভক্তদের দান।মোড়কতলায় জমায়েত হয় সঙ্গীতপ্রেমী ভক্তজন।কমিটি এর জন্য বরাদ্দ করেছে দৈনিক দুতাড়া বিড়ি।এছাড়া অনেকেই বাড়ি বাড়ি হরিনামের দলকে আমন্ত্রন করেন।সেটাও জানাতে হয় চণ্ডীমণ্ডপে এসে।দশ টাকা দিতে হয়।আর একবার যার যেমন সামর্থ্য আছে ফলাহার করাতে হয় হরিনামের দলকে।যেমন কাঁকুরকুচো পাকাফুট  ।ডালভিজে আর আখের গুড়।কেউ কেউ লুচি বোঁদের ব্যবস্থা করে পদ্মপাতায়।

সংক্রান্তির দিনে রাধা-কৃষ্ণের যুগল বেরোয়।দুটো বাচ্ছা ছেলেমেয়েকে রাধা কৃষ্ণ  সাজানো হয়। চণ্ডীমণ্ডপের ঘরে থাকা সেকেলে ফুটোফাটা সাজ পরিয়ে বেশ লাগে।হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি রেকাবি।নাচতে নাচতে যুগল গ্রামপরিক্রমা করে। বয়স্ক মহিলারা আগিয়ে এসে  গড় হয়ে প্রণাম করে।সিকি আদুলি রেকাবিতে দেয়।আর ঘরের তৈরি মণ্ডা বা গুড়ের খণ্ড দিয়ে জলযোগ করায়।মূলগায়েন তখন নেচে নেচে গান ধরেন-

শ্যাম নবজলধর রাই কে ভালো সেজেছে রে

রাই কে ভালো সেজেছে রে।

যেমন চাঁদের আড়ে চাতকিনী রাই কে ভালো সেজেছে রে

যাইরে রূপের বালাই যাইরে রাই কে ভালো সেজেছে রে

যুগল রূপের কি মাধুরী রাই কে ভালো সেজেছে রে

এমন রূপতো কভু দেখি নাই রে

রাই কে ভালো সেজেছে রে।।

দিন দিন হু হু করে খরানি বেড়েই চললো।মাঠ জ্বলে পুড়ে খাক। দুপুরে মাঠে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় গোটা মাঠ ফেটে ধোঁয়া উঠছে উপর দিয়ে। কোথাও এতটুকু সবুজের চিহ্ন নেই।আখের জমিগুলো ঝলসে গেছে। পুকুরের জল মড়ে যাচ্ছে দ্রুত।এখনতো সেই অর্থে চাষের কাজও নেই।শুধু পুকুরের পাঁকতোলা কাজ।একটু শুকিয়ে গেলে সেই পাঁক জমিতে দেবে।কালো পাঁক তুলে এক জায়গায় ডাঁই করা হচ্ছে।মুনিষ রাখালদেরও তেমন কাজ নেই।শুধু গরু চড়ানো আর একবেলা পাঁকতোলা।

চণ্ডীমণ্ডপে এখন জায়গা পাওয়া ভার।উঠোনে তালপাতার জাঁক।সেগুলো পিঁড়েতে তুলে বর্ষার জন্য পেঁকে বা ঘঙ বো্নায় ব্যস্ত।কেউ কেউ পাখা বা বেনা বোনে।কেউ আবার তালপাতার চাটাই। মোড়লের নির্দেশ--চণ্ডীমণ্ডপ ব্যবহার করছো করো। তবে তালপাখা পেঁকে একটা করে দিতে হবে।এটাই নিয়ম।

জষ্টিমাসে রাখালবাগালদের কাজ বলতে মাঠে গিয়ে গোরুর পাঠাপাঠি করা।একদল রাখাল ভাত খাওয়া পর্যন্ত সব গরু দেখে। অন্যদলের তখন ছুটি।তারা বাড়ি গিয়ে কাজ সেরে চান করে খেয়ে দেয়ে মাঠে এলেই এদের কাজ শেষ।ওরা তখন সেই গোধূলি সময়ে গোরুর পাল নিয়ে বাড়ি ফেরে।এরই নাম পাঠাপাঠি।

তখন মাঠ বলতে চারদিক হু হু করা ফাঁকা।লোকে বলতো মেলান মাঠ।অবশ্য সবাই পাঠাপাঠি করত না।গরু মাঠে ছেড়ে দিয়ে রাখালবাগালের দল বটগাছে ঝোল-ঝাঁপ্পি খেলতো।কপালে গামছা ঘসে টিপ নিত।এর নাম রাখালে ফোঁটা ।বিড়ি টানতো আর খিস্তি খেউর করে জমিয়ে তুলতো রাঢ়ের রূঢ় দুপুর বেলা।

দেখতে দেখতে আষাঢ় মাসে এসে গেলে কি হবে বিষ্টির নামগন্ধ নেই।সবাই বলাবলি করতে লাগলো এবার বোধহয় শুকো হবে। ফিনফিনে জল পড়ে খানিকখন।তারপর একটা ঠাণ্ডা বাওরের আরাম।আবার গুমসি গরম।কেউ বললে একটা কিছু ব্যবস্থা করো।এভাবে চলে নাকি!একটা কিছু করতেই হবে।সবাই বললে তবে চলো ঠাকুরবাড়ি।

ভাঙাচোরা ভচ্চারবাড়ি।ভট্টাচার্য মশাইর পাটকাঠির মতো লিকলিকে চেহারা। টিয়েপাখির মতো নাক। কপালে ফোঁটা।মাথার ছুটকো টিকিতে একটা ফুল গোঁজা। মোড়লদের আপ্যায়ন করে নতুন পাঁজি খুলে বললেন--

--পাঁজিতে এবার জল আছে ৬০ আড়ক।শস্য শ্যামলা পৃথিবী। তবে মায়ের দোলায় আগমন।একটুতো লড়চড় হবেই ভাই!

--তাহলে বলছেন জলের আশা নেই!

ভচ্চার মশাই বার কতক নাক চুলকে বললে--

---তা কেন? শাস্তরতো মিছে কথা লয় বাপু।তবে ঘোর কলি!

--হুঁ!

--এক কাজকর দেকি বাপু।ব্যাঙের বিয়ে দাও! দেখি জল হয় কিনা।

কথাটা গাঁয়ের লোকের মনে ধরে গেল।শেষ  কবের ব্যাঙের বিয়ে দিয়েছে কারুর আর মনে নেই।ফেলু খুড়ো বল্লে-বাগিয়ে ব্যাঙের বিয়ে দিলে জল হতেই হবে।তার শশুরগাঁয়ে সেবার জল আর হয়ই না।ব্যাঙের বিয়ে দিতেই সে রাতেই ঝম ঝম করে জল।পচা হাজরা ওলকুটকুটে স্বভাবের।পরাম করে একটা খিস্তি খেলিয়ে বললে--তোর  মারা সব কথাতেই খালি শশুরবাড়ির কথা!

ঝামেলা লেগে যেত।কিন্তু ব্যাঙের বিয়ের উৎসাহে চাপা পড়ে গেল।

বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।খুঁজে খুঁজে পুকুরের গাবা থেকে জোড়া সোনা ব্যাঙ ধরে আনলো ছেলেপুলেরদল।একটা মেল আর একটা ফিমেল।এরপর শুভ দিন দেখে ব্যাঙের বিয়ে শুরু।লোকাচার মানুষের বিয়ের মতো।নান্দীমুখ থেকে শুরু করে গায়েহলুদ সুতো জড়ানো সিঁদুরদান সবই হলো।গিন্নি বউঝিদের উতসাহ কম নেই।মেয়েলি আচার নিষ্ঠাভরে পালন করলে পাড়া প্রতিবেশী্রা।ছেলেপুলেরা হুল্লোড় করে ছড়া কাটতে লাগলো--

ব্যাঙা বেঙির বিয়া দিলাম সবাই মাঠে চল

পুকুর-গড়ে উঠবে ভরে ঝমঝমিয়ে জল।।

পটল লাহার পালকি নিয়ে বর বউকে চাপিয়ে গ্রাম ঘোরা শুরু হলো।বাউরিপাড়ার কাহারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলালো চাষাপাড়ার জোয়ানরা।সারা রাস্তায় লোকজন গিজ গিজ করছে।সঙ্গে মুচিপাড়ার ঢাল ঢোল কাঁসর ঘণ্টা্র আওয়াজ।ঘুড়তে ঘুরতে মোড়কতলা আসতে রাত নেমে এলো।শেষে ব্যাঙদুটোকে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

বেশ কিছু দিন কেটে গেলেও জলের দেখা নেই।সবাই বললে সত্যি ঘোর কলিকাল। নীলু পদ্ধান হালিশহরে চটকলে কাজ করতো।তাচ্ছিল্যের সুরে বললে--ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে যদি জল আসত তাহলে আর লেখাপড়ার শেখার দরকার কি। যত্তসব গেঁয়োভূত।

এদিকে দিন দিন তাত হু হু করেই বেড়েই চললো।ধানজমির বীজতলা জ্বলে পুড়ে শেষ।একফোঁটা বিষ্টির দেখা নেই।সবাই আবার চণ্ডীমণ্ডপে বসলে।একথা ওকথা হতেই কে যেন বললে-- পাইনট মানে শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টকে জলে ফেললে জল হতে পারে।সবাই মিলে তখন গৌরীপট্টকে জলে দিলে।এটাই লোকবিশ্বাস --শিব হলো আদ্দিকালের কৃষিদেবতা।তাকে জলে ডোবালেই জল পড়বে।নদিপাড়ের লোকেরা জলথল না পড়লে শুকনো নদির গাবায় চুয়োকেটে বরুণঠাকুরের আরাধনা করে।শিবলিঙ্গকে জলে ডোবায়।তাদের বিশ্বাস এই ভাবে শিব আরাধনা করলে বৃষ্টি নামবেই।

শিবপুজোর ফল কিনা জানিনা দুদিনের মধ্যে আকালকুর করে মেঘ এলো।দাবিয়ে রাতভোর বৃষ্টি। বাঙের গ্যাঙর ঘ্যাঙর আওয়াজে মাঠে মাঠে বর্ষার আমেজ।চাষির মনে আনন্দ আর ধরে না।ভোর থেকেই নাঙল নিয়ে মাঠে।আশায় বাঁচে চাষা।সারামাঠে এক প্রহর রাত থাকতে মনের সুখে সব জমি চষে।গান করে।আচোট ভাঙা হয়ে গেছে।নাঙলের ফালে বড় বড় ভিজে মাটির চ্যাঙ উঠে আসছে।দুনিয়ার সাদা বগ বসেছে সারা মাঠ জুড়ে।আচোট ভাঙা জমির তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে গেঁড়ি গুগুলি শামুক দুধ কাঁকড়া।এরা জমির তলায় চলে গিয়েছিল সেই ডাকসংক্রান্তির ডাকের জল খেয়ে।আবার চোখ মেলে মাটির উপরে আসতেই বকের দল কপাকপ খাচ্ছে।

আশ্বিনমাস পড়তেই আবার যাকার তাই অবস্থা।আকাশ শুকিয়ে যেন চচ্চড়ি।একফোঁটা বৃষ্টি নেই।মাঠে ঘাটে যেন কান্না ওঠে উজিয়ে।ধানিজমিতে থোঁড়ে দুধ জমছে।এইসময় জলের বড় দরকার।আর তখনি কিনা জল গেল হরে।এ যদি মানুষ হতো কবে লাঠালাঠি লেগে যেত।কিন্তু ভগবানের সঙ্গে কে লড়াই করবে।

তবে আশা সহজেই মরে না।গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটা ক্যানেল আছে।সে প্রায় মজে যাওয়ার অবস্থা।শোনা যাচ্ছে এই ক্যানেলে জল আসবে।অন্তত ডাঙামাঠতো বাঁচবে।কিন্তু গোপন খবর এলো পিরিলে গ্রামের লোকেরা নাকি ক্যানেল দিয়ে জল আসতে দেবেনা।তারা বাঁধ দিয়ে দেবে।গাঁয়ের লোক সব জড় হয়েছে।যে বাঁধ কাটতে আসবে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

এ  গ্রামের লোকেরাও তালঠুঁকছে।সবাই বলাবলি করছে ওরা লাঠি ধরতে জানে আর আমরা পারি না?গ্রামের যুবকরাতো লাঠিতে তেল মাখাতে শুরু করলো।গাঁয়ের ভালোমন্দ লোকজনের অভাব নেই। পিরিলে গিয়ে গাঁয়ের মোড়লদের অনুরোধ করলে বাঁধ যেন কেটে দেয়।কিন্তু বৃথা অনুরোধ।তারা বললে আপনাদের মাঠে জল নিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই।আমাদের এখানেই কেলেন শেষ।

--তাহলে আপনারা বাঁধ দিয়ে রাখবেন।

--তা লয়তো কি!বিশ্বাস যদি না হয় তাহলে ফাঁড়ি চলুন--

--বেশ তাহলে যদি কোন ঝামেলা লাগে আমাদের কোন দেষ নেই।

--সে দেখা যাবে!

--বেশ!

গ্রামে এসেই জরুরি ঢেঁড়ি পড়লো।আবার জমায়েত হলো চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গনে।সকলে তখন মরিয়া।বললো== লাঠি লিয়ে কালই চলো  ।আমরা বাঁধ কেটে দেবো।তাতে মরতে হয় মড়বো।সকলে সমস্বরে রায় দিল।

পরের দিন রাতের অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়লো।সবার হাতে লাঠি টর্চ লাইট।মুখে গামছা বাঁধা।ঐতো বাঁধের গায়ে টিপ টিপ করে আলো জ্বলছে।ঘোর অন্ধকার।সবাই  সন্তর্পণে পা ফেলছে।গোল করে

চারদিক ঘিরে ফেলে।কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না ।মনে হয় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে শালারা।কাছে যেতেই দেখলো কেউ কোথাও নেই। ঝপাঝপ কোদাল দিয়ে কেটে বাঁধ তখন নিমেষের মধ্যে উধাও।জল কুল কুল বেগে ধাবিত হচ্ছে।গ্রামের ছেলে ছোকরারা তখন খিস্তি খেউর করে বললে আয়া শালারা দেখি কত মায়ের দুখেছিস।

নৈশ অন্ধকারে কথা গুলো মাঠময় প্রতিধ্বনিত হলো।

**চার**

গ্রামবাংলার ইতিহাসে ভয়াবহ সত্তর দশক।হাড়হিম করা সময়।গাঁয়ে রাজনৈতিক দল বলতেই একটাই-- কংগ্রেস।সেই দলেই ভিড়ে গেল  জোতদার বড়চাষি।এরাই তখন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।চণ্ডীমণ্ডপও এদের দখলে।গ্রামের লেবারশ্রেণি এমনিতেই তথকথিত ভদ্রলোকের কাছে ছোটলোক কাঙাল বলে পরিচিত।এদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে উঠলো। ভূমিহীন লেবার।অশিক্ষিত বাউরি বাগদি মুচি ক্ষুদ্র চাষি।অধিকাংশ গ্রামেই এরা সংখ্যাগরীষ্ট।হলে কী হবে! সবচেয়ে খারাপ হাল এদের।অধিকাংশ কিশোর তখন চাষিবাড়িতে রাখালি করে।মাঘ মাস থেকে এরা রাখালি করতে শুরু করতো।পেটভাতে  লাগা বলতো।আবার ছাড়ান মানে অন্য কারু বাড়িতে লাগার সুযোগ মিলতো সেই পৌষমাসে।মাইনে নেই।বছরে শুধু দুখানা গামছা।এর উপরে ছিল মুনিশ।যারা কিসেন লাগতো অর্থাৎ স্থায়ীভাবে কাজে লাগতো তারা বছরে নিদির্ষ্ট পরিমানে ধান পেতে।অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বলতে লুঙি গামছা আর খাবার।কাজ বলতে উদয় অস্ত পরিশ্রম।বাকিরা লেবার খাটত।কেউ কেউ দুপুর অব্দি খাটতো।এরা দুপুরেমুনিশ নামে পরিচিত।

অনেক চাষি এদের অসময়ে ধান বা চাল দিয়ে দাদন দিয়ে রেখে দিত।কিন্তু কথার খেলাপি করলে রক্ষে নেই।কাজে যদি না আসতো তাহলে ভয়ংকর কাণ্ড! চাষি  সেই লেবারকে বাড়ি থেকে গলায় গামছা পাক দিয়ে ধরে আনতো হিড় হিড় করে ।বিশেষকরে ভাদ্রমাসে এই লেবারদের অবস্থা ভয়ানক হয়ে যেত।

গ্রামবাংলায় ভাদ্রমাস লেবারদের কাছে ছিল আতঙ্কের।শ্রাবণ মাসে ধানের রোয়াগাড়া শেষ।এইসময় পুরো বেকার বসে থাকতো।এদেরকে কেউ ধারও চট করে দিত না।বাড়িতে যা থাকতো ঘটি বাটি

বেচে পেট চালাতো।কিন্তু সে আর কদিন? তারপরেই নিদারুন অভাব। কেউ কেউ ছেঁচকি চোর হতো।বাড়ির বউরা শাক দিয়ে গেরস্থবাড়ির কাছে মুড়ি বা ফ্যানটুকু নিয়ে যেত। এই জন্য অনেকেই কাজে আসবো কথা দিয়ে টাকা বা চাল নিয়ে অন্যজনের কাজে চলে যেত।তাদের পরিণাম করুন।গেরস্থ চকা মোষের মতো ক্ষেপে গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনতো মোড়কতলায়।তারপরেই বিচারের নামে প্রহসন।লোকে তখন মোড়কতলায় মজা দেখার জন্য হাজির।চাষি গলায় গামছা পাক দিয়ে ঝাঁকার মেরে বলে-

--শালা ছোটলোকের বাচ্ছা।অভর দরিয়া।ধার নিয়ে কেন এলি না বল?

--আজ্ঞে ছেড়ে দাও খুড়ো।শোধ করে দেবো

শোধ করে দিবি।মাগটাকে বিচে দিবি নাকি!

উপস্থিত জনতা হেসে ওঠে।কেউ কেউ বললে শালা আমাকেও ঠকিয়েছে। মার হারামিটাকে।

--ফেল শালা পয়সা।নাহলে তোর একদিক কি আমার একদিক।বলেই গলায় গামছা পাক দিয়ে দিয়ে চড়মারতে শুরু করে।লাথি মেরে ফেলে দেয়।

উপস্থিত দর্শকরা মজা পেয়ে হেসে কুটি কুটি। শেষে মার খেয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে ধমা মুচি কিম্বা নিরান সর্দার।বিচারের এই প্রহসনে ছোটলোক ঘরের মেয়েরাও বাদ জায় না।লুকিয়ে যদি কেউ বেগুন বা কুমরো চুরি করে আর কেউ যদি দেখে ফেলে তার আর রেহাই নেই। চাষির জোয়ান ছেলের একটা বাহাদুরি ছিল অন্ত্যজ ঘরের বউঝিকে একা বাগে পেলে পোঙার কাপড় তুলে মারতো। তারপর চৌকিদার দিয়ে তার স্বামী বা বাবাকে নিয়ে সেই মেয়ে বা বউর ডাক হতো।বিচারে জরিমানার পাশাপাশি নাকখত দিতে হয়। অনেকসময় মেয়ে বউ এদের লালসা থেকেও রেহাই পেত না।বিশেষকরে উৎসবের রাতে স্বামী মদ গিলে পড়ে থাকলে আর রেহাই ছিল না।সুযোগ মতো বউ বা মেয়েকে ঠিক কব্জা করে ফেলতো লম্পটের দল।এদের বিরুদ্ধেই একসময় বামপন্থী আন্দোলন গাঁয়ে গাঁয়ে মাথাচাড়া দিয়েছিল।

নকশাল আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।তবে শহর ও তার লাগোয়া দু একটা গ্রামে নকশালদের দাপট বাড়ছিল।শহরের অনেক ব্যবসাদার এদের ভয়ে থরহরি কম্পমান।এক ব্যবসাদারকেতো খুন করে গাঁ ঢোকার সদর রাস্তার ধারে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।অনেক নকশাল আন্দোলনের মোস্ট ওয়ান্টেড নেতা এঁদো গাঁয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল।দিনের বেলায় কি করতো কে জানে ।কিন্তু রাতে আলাদা আলাদা বাড়িতে শুতে যেত।

শহরাঞ্চলে নকশালের নামে বিভীষিকা।শহররের ইস্কুলগুলো একসময় এদের টার্গেট হয়ে যায়।কেরোসিন পেট্রোল ঢেলে ইস্কুলের অফিসরুমগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল।কাটোয়া শহরের দুটো স্কুল কিম্বা দাঁইহাটের প্রাচীন বিদ্যালয় রেহাই পায়নি।এর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের যাবতীয় তথ্যাবলী পুড়ে ছাই হয়ে যায়।পরীক্ষাব্যবস্থা শিকেয় উঠেছিল।শহরে এক সিনেমার হিরোর মতো অফিসার টহল দিত।তখন যুবকদের লম্বা ঝুলপি রাখার ট্রেণ্ড।লোকে বলতো আঁশবটি।এটা দেখলেই অফিসার জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে সেলুনে নিয়ে গিয়ে চেঁছে দিত।মেয়েরা পিঠখোলা ব্লাউজ পড়লে তারও নাকি বিশ্রী দাওয়াই ছিল।

গাঁ-গঞ্জে লাগামছাড়া অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল অন্যভাবে।বাহাত্তরের পর ইমারজেন্সির সময়।চাষিরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিল এইসময়।চাষির একমাত্র সম্বল ধান।রক্তজল করা সোনার ফসল ধান আর কোথায় লুকিয়ে রাখবে।না!- এ চোরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়।ইমারজেন্সির সময় অতিরিক্ত ধান পুলিস সিজ করতো।এই সুযোগ নিয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুরু হয়েছিল পুলিশের একাংশের দিনে ডাকাতি।গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছিল পুলিশের চর।তারাই অসাধু পুলিসকে খবর দিত।তারপর একসসময় পুলিশ চড়াও হতো চাষিবাড়িতে।আইনের মার-প্যাঁচ কে বুঝবে!প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর দেখাতে না পারলেই গোলা ভেঙ্গে ধান একরকম লুঠ করে নিয়ে যেত।চাষি কান্নায় ভেঙে পড়ত।কিন্তু কে বিচার করবে? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

এর সুযোগ নিয়েছিল সমাজবিরোধীরাও।কোথাও পুলিশের পোশাক পরে ধান লুঠ করতে আসতো।বিশেষকরে গোরুরগাড়িতে করে চাষি যখন শহরে ধান বিক্রি করতে যেত তখন তারা গাড়ি

লুঠ করে নিয়ে চলে যেত।একইভাবে চাল সিজ করত।মেয়েরা বেশির ভাগ চাল নিয়ে যেত নানা রকমের কৌশল করে।তারাও অত্যাচারিত হতো নানাভাবে। এক চরম মাৎস্যনায়ের যুগ এইসময়।

ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মনের অন্দরে ক্ষোভ জমছিল।নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা বাড়ছিল।শহরে ধান বেচতে যাবার সময়ে চাষিরা গোগাড়িতে ধারালো হেসো ইঁট রেখে দিত।দু একজন গাড়িতে থাকলেও জনা কয়েক লুকিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতো। কড়া নজর থাকতো গাড়ির উপর।কোন পুলিশ যদি একাকি গাড়ি থামাতো তাহলে সুযোগ পেলেই তারও ভবলীলা সাঙ্গ হতে দেরি হতো না।এছাড়া অনেক গ্রামে ভয়াবহ বিদ্রোহের আকার নিয়েছিল।এবার সেই কাহিনি বলবো।

শান্ত শিষ্ট গাঁ মাধপুর।অধিকাংশই চাষি।সবই চাষের ধানের উপর চলত।কিন্তু রাস্তায় ধান নিয়ে বেরুলেই লুঠ।পাশের গাঁয়ের গবা আর লবা।দুই ভাই মূর্তিমান ত্রাস।আর্মিতে কাজ করতো।এতেই তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতো।যেমন শক্তিমান মরদ তেমনি দুঃসাহসী।দুই ভাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে ধান নিয়ে যাওয়া কঠিন ব্যাপার।কারুর কিছু বলার নেই ।প্রকাশ্যে লুঠ করে নেবে।তার সঙ্গে পুলিশের বিরাট খাতির।এমন কি ওপরমহলেও তার চেন।যখন তখন পুলিশ আসে তার বাড়িতে আসে।ফিস্টি করে।কে তাদের ঘাঁটাবে।স্থানীয় রাজনীতি তাদের কব্জায়।প্রতিবাদ করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়।কন্তু বাপের উপর বাপ আছে।

মাধপুরের একসময় কুখ্যাত ছিল দুলে ডাকাত।জাতে বর্গি হলে কি হবে এখনো তার গায়ে হাতির বল। কিন্তু ডাকাতি করা ছেড়েছুড়ে জাত ভিখিরি বোষ্টম।সেই মাধপুরের মোড়লেদের বললে-- গবা লবা তার কাছে নস্যি।দু দিন কার যুগী লয়ঘাড়ে মুড়ে জট।হুড়িয়ে দুশালাকে ধর ।দিয়ে মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দে।আমরা কি সব চুরি পড়ে আছি নাকি!নেহাত মাহান্তকে কথা দিয়েছি তাই।লইলে ওদেরকে এদ্দিনে হাজম করে দিতাম।চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরে।

শুধু মাধপুর নয়,পাঁচখান গাঁয়ের লোক লবা গবার প্রতি রেগে লাল হয়ে আছে।সবার মুখে এক রা-ঐ দুই শ্যালো দিন নাই রাত নাই পুলিশ ডেকে আনছে।আর বুকের পাঁজর ভেঙে গোলা লুঠ করে লিছে।কিছুই করা যেছে না বাপু।

দুলে বর্গি গাঁয়ের যুবকদের ক্ষ্যাপাতে লাগলো।তারা তলায় তলায় চণ্ডীমণ্ডপে গোপনে মিটিং বসলো।

দুলে বর্গি একদিন সাঁজবেলায়  গিয়ে হাজির লবা গবার কাছে।গোপন খবর দিলে মাধপুরে জনা পাঁচেক চাষির ধান বাঁধা আছে গোয়ালঘরে।প্রথমটা তারা দুলের প্রতি সন্দেহ করলেও এমন সব খবরাখবর আর তথ্য মিলতে লাগলো লবা গবা অবাক হয়ে গেল।তাদের বখরা্র হিসাবও হয়ে গেল।লবা গবা জানালো এই লাইনে যদি সে থাকে তাহলে রাতারাতি তাকে বড়লোক করে দেবে।অন্ধকারে বেড়িয়ে এসে দুলে বর্গি জানালে গাঁয়ের  লোক তাকে সন্দেহ করে।বুঝতেইতো পারছো তার বাড়ি যেতে হলে রাতে যাওয়ায় ভালো।লবা গবা বললে কোন চিন্তা নেই । বলেই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দুলে বর্গি।

মাধপুরে দুপুর থেকে কবিগান হচ্ছে। শিবতলায় জনসমুদ্র।বিকালে কবিগানের বোলকাটাকাটি শুরু হয়েছে। একপ্রহর রাত হলো তবু গান ভাঙবার নামটি নেই।মন্ত্রমুগ্ধ গ্রামবাসীরা।এমন সময় কারা যেন চিৎকার করে উঠলো ডাকাত ডাকাত!!ধর ধর মাঠে মাঠে!!

সে এক ভয়ানক ব্যাপার!লোকে  হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে ছুটছে।কাটারি দা কুড়ুল লাঠি নিয়ে সবাই ছুটছে।মেয়েরা যে দিকে পারছে ভয়ে পালাচ্ছে।কিন্তু গাঁয়ের ভিতরে কিচ্ছুটি কোথাও নেই।সবই মাঠে।ঘন অন্ধকা্রে দিগন্তজোড়া মাঠ।শুধু  বিন্দু বিন্দু টর্চের আলো আর সমবেত জনতার মার মার চিৎকার।এদিকে ডাকাতও ছুটছে । চার পাশের গাঁভেঙে লোক আসছে।উন্মত্ত জনতা  তার পিছে হিংস্র আক্রোশে ধাওয়া করে।তারপর একসময় শুধু  চড়বড়িয়ে লাঠির আওয়াজ।সব শেষ।টর্চের আলোয় ডাকাতের মুখ দেখে সবাই চমকে উঠলো

===আরে!এতো লবা।গবাটা শালা ভাগ্যের কৃপায় বেঁচে গেছে।

পাঁচ

পেঁচো মোড়লের ছেলে রোহিতকে কি মনে আছে? সেই যে মোড়কতলায় বিচারে দোষি সাব্যস্ত হয়ে একদিন অপমানে লজ্জায় রাগে ক্ষোভে গ্রাম ছাড়া হয়েছিল? তার পরিচয় এখন কমঃরোহিত মণ্ডল।দুঁদে বামপন্থী কৃষকনেতা।বহু ঘাটের জল খেয়ে বামপন্থি আনদোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।প্রথমে কলকাতার এক মিস্টির দোকানে কাজ করত।এখানেই  কমরেডদের সঙ্গে তার

আলাপ।তারপর  পার্টির সক্রিয় কর্মি।কর্মদক্ষতা আর তৎপরতার জেরে চর চর করে উপরে উঠে যায়।প্রথম শ্রেণির নেতাদের কাছের মানুষ হয়ে ওঠে কমঃরোহিত।

গণসংগঠনের কাজে  লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মাঝে নিজের গ্রামে আসতো।বিশেষ করে সর্দার পাড়ায়।সেখানেই লুকিয়ে থাকতো।একসময় মিসা আইনে জেলও খাটে।তারপর চোখের সামনে বিরিক্ষি বটগাছের মতো  ঝড়ে উপরে যায়  কংগ্রেস সরকার।ক্ষমতায় আসে বামফ্রন্ট সরকার।কমঃরোহিত মণ্ডল জেলার  ডাকসাইটে কৃষকনেতা হিসাবে  সুপরিচিত হয়ে ওঠে।বড় বড় চাষির অনেক জমি তার নেতৃত্বে খাস হয়ে যায়।বিলিয়ে দেওয়া হয় হাড়ী বাউরি মুচিদের।রাস্তায় পড়ে মোরাম।গ্রামে ঢুকে যায় ইলেকট্রিক।যে করুণার জন্য রোহিত গ্রাম ছেড়েছিল সেই ওঠে তার পিয়ারের লোক।

মোড়কতলার পাশেই গড়ে উঠেছে ঝাঁ-চকচকে পার্টি অফিস।এখন চণ্ডীমণ্ডপের আর সে দিন নেই।গ্রামের বিচার হয় পঞ্চায়েতে।ছোটলোকদের কাছে  ট্যাঁফুঁ করে কার সাধ্যি।বেশি বেয়াদপি করলে চাষার জোয়ান ছেলেকে পিটিয়ে ঢোল করে দেয় সর্দার পাড়ার ছেলেরা।মুচিপাড়ার মেয়েবউদের হাতে এমন মার খেয়েছিল ছিরু চ্যাটুজ্জে লজ্জায় সে আর বাড়ি থেকে বেরোয় না।মাল খাওয়ার সখ তার ঘুচিয়ে দিয়েছে।গ্রামের ভিতর পার্টির যখন মিছিল যায় তখন সবার হাতের থাকে অস্ত্র ,লাঠি। কারুর কিছু বলার নেই। ভাঙাফুটো চণ্ডীমণ্ডপে বসে বয়স্কচাষিরা ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কি দিন এলোরে বাপ।ছোটোলোকের বাড় বাড়িয়ে দিল।

প্রথম প্রথম রোহিতের বিপক্ষ থাকলেও তার কূট চালে বিরোধীরা ছত্রভঙ্গ হয়।কেউ জমি জায়গা জলের দড়ে বেছে দিয়ে শহরে পালায়।কেউ পার্টিফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিয়ে দলে ভিড়ে যায়।ভিড়ে না গেলে কি রেহাই আছে? কোনদিন এসে দেখবে তার জমিতে বাউরি বাগদি পাড়ার লোকজনের মিছিল করে এসে লাল ফ্লাগ পুঁতে দিয়েছে।মানে জমি খাস হয়েছে।জোর করে দখল নিয়েছে সাধারণ মেহনতি মানুষ।

গাঁয়ের বয়স্করা একদিন রোহিতের সঙ্গে দেখা করে কথাটা তুললো।

--বাবা রোহিত! তোমার বাবা পাঁচুগোপাল  চণ্ডীমণ্ডপের জন্য কত কী করেছিল।তুমি যদি বাবা একটু দেখো। একেবারে যে ভেঙে পড়েছে।যতোই হোক বারোয়ারি বলে কথা।তোমারতো এখন বিরাট ক্ষমতা-

আর কিছু?

না মানে!তাই বলছিলাম

--না চণ্ডীমণ্ডপ নিয়ে আমাদের পার্টির কোন মাথা ব্যাথা নেই।ওখানে সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচার আর অত্যাচার হয়েছে।ওন্য কিছু থাকলে বলতে পারো।

বয়স্করা বুঝতে পারলো রোহিতের ক্ষত এখনো শুকোইনি।সুতরাং মানে মানে কেটে পড়াই ভালো।

রোহিত দিন দিন প্রতাপশালী হয়ে পড়ে।জেলা পরিষদে নির্বাচিত হয়।ক্ষমতার হাত আরও প্রসারিত হয়।পাল্লা দিয়ে গড়ে ওঠে শত্রু।গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দেয়।এই নিয়ে স্ত্রী অসীমার সঙ্গে প্রায় কথাকাটাকাটি হয়।বার বার তাকে পার্টি ছেড়ে দিতে বলে।কিন্তু ছেড়ে দেওয়া কি এত সহজ?

চণ্ডীমণ্ডপের অবস্থা ভালো নেই।এবার কালবোশেখি ঝড়ে চাল গেছে উড়ে।জষ্টিমাসের মিগের বাতের জলে দেয়ালের অবস্থা খুবই খারাপ।চাল ছাইতে টাকা তুলতে হিমসিম খায়। বাগদি বাউরি মুচি পাড়ায় সব বড় বড় ক্লাব গড়ে উঠেছে।ভদ্রলোকেরাও ক্লাব তৈরি করছে।কেউ আর চণ্ডীমণ্ডপে আসতে চায় না।চাঁদাতো দিতেই চাই।সঞ্জয় মোড়ল এখনো টুংটাং চালিয়ে যাচ্ছে আর কি!

হাঁসু সর্দার রোহিতের বিপরীত গোষ্ঠীর নেতা।তারও ক্ষমতা কম নেই।তাকে গিয়ে অনেকেই বললো--একটা কিছু করা জায় না? এই পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপকে বাঁচানো যায় না? হাঁসু জানায় নিসচয় যায়।কিন্তু সবক্ষেত্রে বাগরা দেয় কমঃরোহিত মণ্ডল।আর ওকে কে ঘাঁটাবে বলো?

রোহিতের মন মেজাজ ভালো নেই।গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য দল তাকে বার বার সতর্ক করছে।কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ বড় বালাই।ইদানিং মন তার বড় খারাপ।কী একটা দুষচিন্তা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়।প্রশাসন থেকে তাকে বর্ডিগার্ড দেওয়ার কথা বলে।দুস বলে উড়িয়ে দিয়েছে দুঁদে এই কৃষকনেতা।

কয়েকদিন সে জেলায় জায়নি।অনেক রকম খবর আসছিল। যতদিন যাচ্ছে পার্টিতে বেনোজল ঢুকে পড়েছে।না এবার ধীরে ধীরে কাজের বহর কমাবে।গ্রামে থাকলে সবচেয়ে নিরাপদ।বিশেষকরে পার্টি অফিসে।

ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি হচ্ছে।আজই আর পার্টি অফিসে দু একজন ছাড়া কেউ আসেনি।সামনেই চণ্ডীমণ্ডপটা। ভেঙে পড়েছে।যেন ভুতুরে বাড়ি।গাঢ় অন্ধকার মাখা।বৃষ্টিটা ধরে এসেছে।রামাকে চা করতে বলে কি মনে হলো একবার চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যেতে মন চাইলো।অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেকক্ষন একাকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল।চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার।ভাবছিল অনেক কথা।তবে এখানে এলেই সেই অপমান ঘৃণার দৃশ্যটা তার মনে পড়ে।তবু চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এলেই তার মনটা কেমন হয়ে যায়।ধুর আর ভাল্লাগেনা।ঐতো ডাকছে রামা।এতক্ষন চা হয়ে গেছে।

--কে?

কয়েকটা পদশব্দ শোনা যায়।অন্ধকারে কয়েকটি চোখ ঝলসে উঠলো।তারপর শুধু একটা গোঙানো আর্তনাদ!

কমঃরোহিত মণ্ডলকে খুন হতে হলো নৃশংস ভাবে ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গনে।সকাল থেকে পুলিশে ছয়লাপ।সঙ্গে প্রচুর নেতাকর্মি সাধারণ মানুষ।ইতিমধ্যেই বিরোধীরাজনীতির বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা।সবাই বলছে এই কাজ বিরোধী রাজনীতির।অনেকেই জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখতে শুরু করেছে। দলীয় পার্টি অফিসে কমঃহাঁসু সর্দারের নেতৃত্বে যখন কমঃরোহিতের মরদেহ নিয়ে যাচ্ছিল মিছিলের মধ্য দিয়ে তখন রোহিতের বিধবা স্ত্রী হাউ মাউ করে কেঁদে বলেছিল  একদম পার্টি অফিস নয়। এই চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গনে ওকে একবার নামাওগো।ওর মুখটা শেষ দেখে নি।

তার কথাগুলো ঢাকাপড়ে গেল উন্মত্ত জনতার শ্লোগানে।